বন পাহাড়ি ডারিংবাড়ি

চন্দ্রিকাপ্রসাদ ঘোষাল

কাশ্মীর উপত্যাকার সঙ্গে সাদৃশ্য সুদূর, তবু পর্যটন-পরিভাষায় এর নামকরণ হয়েছে 'ওড়িশার কাশ্মীর'। বিজ্ঞাপনের ইন্দ্রজালে ডারিংবাড়ির এই মোহিনী অভিধা অর্জন। পুজোর মরশুমে পর্যটকের ঢল নামেনা এখানে মধ্য শীতকালে দু-চারজন যা আসে, তাদেরও বেশিরভাগটাই বরফের সন্ধানে।

ওড়িশার ফুলবনি জেলার এই অঞ্চলে তুষারপাত হয়। এরকম এক জনশ্রুতি আঁকড়ে, সেই দৃশ্যের সাক্ষী হবার বিপুল বাসনায় কেউ কেউ ডিসেম্বরে হাড়-কাপানো ঠাণ্ডায় এখানে হাজির হয়। তারপর যথারীতি ভ্রমণার্থীরা তুষারশীতল হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। তাদের ব্যর্থ বিদায় আর স্বপ্ন সংক্রামিত করে পরের শীতে সম্ভাব্য ভ্রমণেচ্ছুদের। এই পর্যটন বিপ্লবের যুগেও এ পথে পা বাড়ানো মানুষের আনাগোনা হাতে গোনা। পর্যটন মানচিত্রে তাই বারিংবাড়ি প্রায় অপাংক্তেয়। পুরী, চিল্কা কিংম্বা গোপালপুরের পাশে মলিন, বিবর্ণ তার অবস্থান।

তবু ভূস্বর্গের সঙ্গে তুলনা শুধুই কি ভাষার কুহক? শুধুই পর্যটন পিপাসু জনতার সঙ্গে বিজ্ঞানী রাংতা মোড়া বাণিজ্যিক ছলনা? বোধহয় নয়। ব্রহ্মপুর (বা বেরহামপুর) থেকে ডারিংবাড়ি যাবার পথ রয়েছে দুটি। লোকাল বাসে ফুলবনী হয়ে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার। এটি ঘুরপথ। দ্বিতীয় এবং কম দূরত্বের পথটি হল গাড়ি ভাড়া করে রায়পুরমুখী ২১৭ নং জাতীয় সড়ক ধরে ১২৫ কিমি পথ পেরিয়ে পৌঁছানো ৪০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ওড়িশার এই ছোট্ট, শান্ত গ্রামটিতে। জাতীয় সড়ক ধরে চলতে চলতে ক্রমশ মুগ্ধতা বাড়তে থাকে দুপাশের নৈসর্গিক শোভায়। দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চোখ রেখে সবুজ চিরে বুক চিতিয়ে পড়ে থাকা পথের মাঝে মাঝেই থেমে দু-দণ্ড কাটিয়ে যেতে মন চাইবে। ছোট্ট সোরাডা শহর পেরিয়ে গেলে ছুটি নেয় সমতল। পথের ধারে ছোট্ট সাইনবোর্ড একপায়ে দাঁড়িয়ে— Darngbari Ghata benins. 'ঘাটা' বা 'ঘাটি', অর্থাৎ পাহাড়। শুরু হয় পাহাড়ি এলাকা। এখান থেকে প্রায় ২৫ কিমি পর্যন্ত প্রকৃতির জগতে যাবতীয় অধিকার শুধু অরণ্যের। সোরাডা ফরেস্ট রেঞ্জ। সর্পিল পথের নির্জন চড়াই ভাঙতে বড় বেশি উতরোল শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটক যাত্রা স্মৃতি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে অরণ্যপথ ডানদিকে বাঁক নেয়। ডারিংবাড়ির লোকালয় শুরু হয়ে বাজার এলাকায় এসে থামে। গ্রামের মাঝখানে প্রায় এক কি.মি. মত জায়গা জুড়ে ধূলো ওড়ানো জমজমাট বাজার, দোকানপাট, গাড়িঘোড়া, হৈচৈ নিয়ে। এই গঞ্জ এলাকা ছড়িয়ে যেদিকেই এগানো যাক দু'হাত ভরে ডারিংবাড়ির উপহার শুধু সবুজ আর সবুজ। যেদিকেই দৃষ্টি ছড়িয়ে দেওয়া যাক পাহাড় এসে সদর্পে দাঁড়াবেই সামনে। ডারিংবাড়ির পুরোটাই পাহাড় ঘেরা সবুজ উপত্যকা। আর জনবসতি, চাষের খেত আর অজস্র গাছপালার সমারোহের মাঝখান দিয়ে রাঙামাটির পায়ে চলা পথ সবদিকে চড়াই উতরাই ভেঙে চলে গেছে পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় পাহাড়ের দিকে। উপত্যকার ঢাল বেয়ে ফসলের খেত। প্রান্তর জুড়ে সর্ষে ফুলের সোনালি সাল্য। চড়ে বেড়ায় গরুর পাল গলায় বাঁধা ঘন্টায় মিঠে বোল তুলে। পাইন বনই ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দেয় স্থানীয় জলবায়ুর খবর। অক্টোবর মাসেও যখন সারা ওড়িশা গরমে ঘামছে, তখন ডারিংবাড়ির শীতের হাওয়ায় কাঁপন লাগছে পাইন বনে। সন্ধ্যের পর থেকে তা আরও জমাট। রাতের নিসর্গ মোহময়ী। তারাভরা আকাশের তলায় স্তব্ধ চরাচর জুড়ে থোকা থোকা অন্ধকার।

ডিসেম্বরের শেষদিকে পারদ নেমে যায় হু হু করে। কখনও কখনও তার অবনতি জিরো ডিগ্রি। সেই সময়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের ঘটি-বাটি, বালতিতে ধরে রাখা জল জমে বরফ— এমনকি ধানের শিষ ও ঘরের চালে সারা রাত ধরে ঝরে পড়া শিশিরও জমে যায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় তুষারপাত হয়েছে বুঝি সারারাত ধরে। ডারিংবাড়ির তুষারপাত ঘিরে যে রহস্য গল্প পর্যটন জগতে চালু রয়েছে, তাতে স্থানীয় মানুষরাও অবিশ্বাসী নয়। কিন্তু এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে নানা মুখ থেকে নানা জবাব আসে। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেল রণজিতকুমার নায়েক নামে স্থানীয় এক এন.জি.ও-র সম্পাদকের কাছে। রণজিতবাবু অত্যন্ত উদ্যমী যুবক। তাঁর সংগঠন 'প্রসাদ' বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে যুক্ত। অবহেলিত আদিবাসী শিশুদের নিয়ে কয়েকটি স্কুল চালায়। পড়ুয়াদের খাবারদাবারও যোগান দেয়। চাষীদের ঠকিয়ে বাইরে থেকে আসা মহাজনরা যেভাবে তাদের ফসল প্রায় লুট করে নিয়ে যায়, তা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর তারা। তবে তিনিও সঠিক বলতে পারলেন না আদৌ কখনো ডারিংবাড়িতে বরফবৃষ্টি হয়েছিল কিনা। অন্যরা কেউ বলে কুড়ি, আবার কারুর মতে পঞ্চাশ বছর আগে সত্যিই নাকি এই ঘটনা ঘটেছিল। হন্যে হয়ে বরফ সন্ধান অনেকটা খ্যাপার পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানোর মতই। অরণ্য ভ্রমকারীদের বেশিরভাগের চোখেই যেমন বন আর বন্যপ্রাণী সমার্থক। জঙ্গলে গিয়ে বাঘ, হাতি, বাইসন কিংবা নিদেনপক্ষে একটি হরিণও দেখতে না পেলে কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে যাওয়াই মাটি। তেমনি বরফের টানে ডারিংবাড়িতে এসে তার সন্ধান না পেয়ে অনেকেই ব্যাজার। যেমন বন না থাকলে এ জায়গাটির অস্তিত্বের আর কোনও মানে নেই। তার দ্রষ্টব্যের ভাঁড়ার বুঝি শূন্য। আসলে আজকের গড়পড়তা ভ্রমণার্থীর মানসিকতায় নতুন জায়গাটিকে দেখাশোনা ও অনুভব করার কোনও দায় নেই। বস্তুতপক্ষে, বেড়াতে যাওয়া মানেই এমন কিছু নতুন অভূতপূর্ব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবার বাসনা ও যা বাড়ি ফিরে অন্যদের সবিস্তারে বলার মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিরল ব্যক্তি হিসেবে ভাবার স্বপ্ন চরিতার্থ হবে। বরফ পড়ুক আর নাই পড়ুক, ডারিংবাড়ির শীতল, নির্জন উপত্যকা প্রদেশ যে এক চিলতে কাশ্মীর দখল করে বসে আসে চোখের আড়ালে, তা মেনে নিতে বাধা কোথায়? আর এই প্রকৃতি ও জলবায়ুর দাক্ষিণ্যে ডারিংবাড়ির উষ্ণীষে রয়েছে আরও

একটি পর্যটন গন্ধ মাখা অভিধা— সামার রেসোর্ট— তবু গ্রীষ্মকালের চমৎকারিত্ব বরফ-হন্যে শহুরে মনকে টানেনা। বাস্তবিকপক্ষে বরফের গল্পটি সরিয়ে রাখলে এই নিরালা জগতের তুলনা বরং অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু উপত্যকার সঙ্গে অনেক বেশি মানানসই।

ডারিংবাড়ি জনবসতি যে অরণ্যের আত্মসমর্পণের বিনিময়ে পাওয়া, তা ধরা পড়ে এক নজরেই। ধরা পড়ে জেলার নামান্তরের ইতিহাস থেকেও। এই উপত্যকা থেকে সম্প্রতি বিদায় নিয়েছে ফুলবনি জেলার নাম। ফুলবনি এখন দুটি জেলায় বিভক্ত— বৌধ এবং কন্ধমলঙ্গ ডারিংবাড়ির অবস্থান দ্বিতীয় জেলায়। কারণ কন্ধ উপজাতি ছিল এখানকারই আদিম অধিবাসী। তাদের সুবাদেই এখানে জঙ্গল সাফ করে বসবাসের সূত্রপাত। আগে ছিল ঘন বন। হাতি, লেপার্ড, বাইসন, হরিণের মুক্তাঞ্চল। সেই যুগেই এই অঞ্চলে বৃটিশদের আনাগোনা। তারা বিদায় নিয়েছে। রয়ে গেছে তাদের উত্তরসূরি মিশনারিরা। আদিবাসী জীবনে মিশনারীদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ওড়িশার অবহেলিত আর পাঁচটা উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকার মতই। বিশেষ করে এখানকার আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার অনেকটাই তাদের তৎপরতা। 'প্রসাদ' সংগঠনের সম্পাদক রণজিৎ নায়েকও মিশনারীদের ছত্রছায়ায় মানুষ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত। তাঁর বোন মিশনারীদের আনুকূল্যে কলকাতায় পড়াশোনা করছে। চারদিকে তাকালেই দিব্যি চোখে পড়ে মিশনারীদের ব্যাপক কর্মকাণ্ড। তাদের একটি আশ্রমও রয়েছে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই। সেখানে আতিথ্য গ্রহণে বাধা নেই।

এখানকার চাষীদের অবলম্বন যে সব ফসল তাদের মধ্যে প্রধান হল আদা, সর্ষে আর হলুদ। আর সরকারি ব্যবস্থাপনায় এখানে গড়ে তোলা হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘেরা কফি খামার। গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে কফি ফল থোকা থোকা। সেই খেতের মধ্যে দিয়ে সরু সরু পায়ে চলা পথের কাটাকুটি কেলা। সে পথ ধরে আনমনা হয়ে চলতে থাকলে অনন্ত নির্জনতা এক অদ্ভুত ভাললাগা হয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়। রোমান্টিক পর্যটককে কাছে ডাকে শব্দহীন সবুজের নিবিড় ছায়ায়। কফি খামারের গা ঘেঁষে চলে যাওয়া বড় রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগোলে ইউক্যালিপটাস আর তারপর পাইন বনের রাজত্ব। দু-একজন কাঠকুড়নি ছাড়া সে অরণ্যে একাকীত্বে উপদ্রব ঘটানোর মতো আর কেউ নেই। বনপথে পায়ে পায়ে খানিকদূর এগোলেই কানে নিশ্চিত বেজে ওঠে জলতরঙ্গ। শব্দভেদী পদচারণায় সেই জলাধার আওয়াজ অনুসরণ করে লতাপাতার আদর উপেক্ষা করে কিছুটা ভেতরে ঢুকলেই দেখা দেয় গহন পথে বয়ে চলা এক চিত্রার্পিত স্রোতস্বিনী। প্রকৃতিই যেন তার দুয়ারে পাথরের বাধা দিয়ে রেখেছে। এই পরিবেশ ইদানিং ওড়িয়াদা ছবির আউডোর শুটিং এর জন্য বেছে নেওয়া হয় জেনে এতাবৎ বিরক্ত, হতাশ জনাকয়েক পর্যটকের প্রাণে হঠাৎ পুলক লাগে। ঝটিতি বেরিয়ে পড়ে এতক্ষণের বাক্সবন্দী ক্যামেরা। অরণ্যের পরম সৌভাগ্য শুটিং লোকেশন হয়ে ওঠার সুবাদে ট্যুরিস্ট স্পটের সম্মান লাভ। পর্যটন সংস্থাগুলির নজর পড়বে। এবার নিশ্চিত বেড়ে যাবে তার কদর। সাইট-সীয়িং সার্থক হবে সফরকারী জনতার। ঘুচে যাবে অরণ্যে রোদন।

কিংবদন্তী শিকারী কেনেথ অ্যাণ্ডারসন বলেছিলেন, People who come into the jungle seeking urban amenities are sheer nuisance। তিনি ভাবতেই পারেননি কখনো, অরণ্য জগতে শহুরে আরাম লভ্য না হলে অরণ্যপ্রেম জমেনা আধুনিক টুরিস্টের। বিলাস বহুল বনবাংলো কিংবা টুরিস্ট লজে থাকবে অন্তহীন পর্যটকের অবিরত কোলাহল। অরণ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতির বিপুল সমারোহকে পর্যটন বাণিজ্যে সফলভাবে ব্যবহার করতে হলে শুটিং লোকেশন হিসেবে বিজাপনী প্রচার এক অমোঘ অস্ত্র। অরণ্য নয়, রুপোলী পর্দার নায়ক-নায়িকাদের পদধূলিধন্য পরিবেশ ছুঁয়ে যাওয়ার লোভ যে শহুরে পর্যটন জনতার সফর সুখ চরিতার্থ করে, তারাই ট্যুরিজম ইণ্ডাস্ট্রির জীয়নকাঠি। তাদের কথা ভেবেই বছরখানেক আগে তৈরী হয়েছে 'হিলভিউ পয়েন্ট'। ডারিংবাড়ি বাজারের চৌমাথা থেকে ফুলবাড়ির রাস্তায় দুকিলোমিটার এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরে পাহাড়ি পথে খানিকটা চড়াই ভেঙে উঠলেই এই ভিউ পয়েন্ট। অরণ্যদেবের টেবিলের মতো একটি ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় কংক্রিটের কয়েকটি সুদৃশ্য বেঞ্চ। আর পাশেই সিঁড়ি বেয়ে চক্রাকার ওঠা গোল একটি ব্যালকনি, যেখান থেকে ডারিংবাড়ির নিসর্গ প্রমাণ সাইজের ক্যালেণ্ডারের ছবি হয়ে ভেসে ওঠে তার চারপাশে পাহাড় আর পাইন বন নিয়ে। অনেকটা যেন নির্জন টাইগার হিল। হিলভিউ -এর এই সবুজ উপহার ম্লান হয়ে যায় চা-স্ন্যাক্স এর কোনও স্টল সেখানে না থাকায় হঠাৎ এসে পড়া আমোদ - প্রত্যাশী জনকয়েক ভ্রমণার্থীর অঝোর আফশোশে। ডারিংবাড়ির দুর্ভাগ্য সে নিজেকে আজও আধুনিক পর্যটন বাণিজ্যের প্রকৃত পসরা করে তুলতে পারেনি। সকালের কুয়াসামোড়া সবুজ উপত্যকা, হিমেল সন্ধ্যা রাতের গভীরে দূরত্বে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ের সারি, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বর্ণান্তর, লালে লাল ফুলে ফুলে ছাওয়া সার সার গাছ এখনও তাকে আজকের টুরিষ্টভোগ্য করে তুলতে পারেনি। সে পড়ে রয়েছে বিপন্ন প্রজাতির রোমান্টিক পর্যটকের আপনজন হয়ে। শান্ত, মিষ্টভাষী, স্থানীয় মানুষ বহিরাগতদের দৌরাত্মে এখনও বিরক্ত, বিপর্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এখনও তাই আগন্তুকের সঙ্গে তাদের আচরণ বন্ধুভাবাপন্ন। কিন্তু স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশার জন্য যে সহজ মানসিকতা জরুরী, তার পরোয়া করেনা আত্মসুখী ভ্রমণার্থী। তার শহুরে নাকের উচ্চতা বড্ড বেশি। এই বিদ্বের অভাবই ডারিংবাড়ি সফরের সুখ। তার বনানীর সঙ্গে একা একা কথা বলা যায়। তার টাইগার হিলে টুরিস্টের ঢেউ উথলে উঠে নিরালা সৌন্দর্যের আবেশকে কদর্য করে তোলেনা। অথবা বলা ভাল, তোলেনি এখনও।

আর মজার কথা, ভ্রমণ নিয়ে এত পত্রপত্রিকা নিরন্তর যেসব তথ্য সরবরাহ করে চলেছে, তাতে ভুল তথ্য আকছার। ডারিংবাড়ি সম্পর্কে 'সুখী গৃহকোণ' নামে একটি পত্রিকার জুন ২০০৩ সংখ্যায় লেখা হয়েছে 'কন্ধদের নামানুসারেই ফুলবনি জেলার নাম পাল্টে অধুনা হয়েছে কন্ধমল'। লেখকের জানা নেই, ফুলবনি জেলা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটির নাম বৌধ এবং অপরটি কন্ধমল। আর ১লা অগস্ট ২০০৪ তারিখের ইংরেজি দৈনিক 'দি টেলিগ্রাফ' -এ লেখা হয়েছে, Trekkers and private vehicles to darngbari charge around rs 2000 for 250 kms. তথ্যটিতে বিভ্রান্তির সমূহ অবকাশ রয়েছে। ব্রহ্মপুর স্টেশন থেকে ডারিংবাড়ির গাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা থেকে

১৩০০ টাকার মধ্যে। দূরত্ব ১২২ কিমি। আড়াইশো কিমি দূরত্ব ফুলবনি হয়ে ঘুর পথে বাসরুটের। ওই পথে গাড়ি করে দ্বিগুন সময় ও অর্থ খরচ করে যাবার মতিভ্রম কার হবে? ওই লেখাটিতেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, carry toffees for tribal children to break the ice in the hamlet. আদিবাসী শিশুদের সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য ভুক্তভোগী নেপালের পর্যটন কেন্দ্রগুলি। ভ্রমণবিলাসী সাহেব - মেমদের টফি-উপহারের ঠ্যালা সামলাতে গিয়ে সেখানকার অজস্র ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ভুগছে দাঁতের ব্যাধিতে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে তার স্নেহ কী বিষম বস্তু। নাই বা থাকলো নেপালের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দাঁত, ৫০০,০০০ হেক্টর অরণ্য প্রতি বছর সাফ করে পর্যটন ব্যবসায়ে তো টেক্কা দিচ্ছে সব্বাইকে! নেপালের কথা থাক। ডারিংবাড়িতে নিজেদের উঠোনে খেলে বেড়ানো শিশুদের একটু জমা করে ডাকলেই কাছাকাছি আসে। হেসে লুটোপুটি হয়। টফির টোপ দেবার প্রয়োজন পড়েনা।

আধুনিক পর্যটনকেন্দ্র এখনো হয়ে উঠতে পারেনি বলেই পর্যটকের ঢল নামেনা এখানে। তাই বহিরাগতদের জন্য আস্তানাও অপ্রতুল। রয়েছে রাজ্য সরকারের পূর্তবিভাগের একটি বাংলো। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নিয়ে পছন্দসই আবাস হলেও তার অবস্থান একেবারে বাজার এলাকার চৌমাথার ওপর। সম্প্রতি ডারিংবাড়িতে ওড়িশা পর্যটন সংস্থার পান্থনিবাস গড়ে উঠেছে। দ্বি-শয্যার ঘর। প্রতিটি ভাড়া মাত্র একশো টাকা। উপত্যকার ঢালে অতি চমৎকার পরিবেশে চার ঘরের সুদৃশ্য এই অতিথিশালাটি বড় বেশি উদাসীনতার শিকার। থাকার আয়োজন দিব্যি, কিন্তু সেখানে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। বাজারের কোনও হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করলে পান্থনিবাসে অনাহার অনিবার্য। কারণ সেখানে রান্নার জন্য পর্যাপ্ত বাসনপত্রও নেই। অথচ রান্নাঘরটির আকার ও আধুনিকতা দেখার মত। তবে বাজার এলাকায় হোটেলের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই মাত্র গুটিকয়েক। চৌমাথার মোড়ে নামহীন যে ছোট্ট ভোজনালয়টি রয়েছে, তা শহুরে হোটেলের পরিসর ও পরিচ্ছন্নতায় উত্তীর্ণ না হলেও রান্নার মান দুরন্ত। মালিক একাই সব সামলান। তাঁর নিজের হাতে স্বাদু ব্যঞ্জনের সঙ্গে উপরি পাওনা সদাহাস্যময় উজ্জ্বল মুখটি। অর্ডার নেবার পর খাবার তৈরি করতে গিয়ে যদি তাঁর মনে হয় মেনুতে কিছু গোলমাল রয়েছে, পত্রপাঠ কারুর সাইকেল কিংবা মোটরবাইক চেপে সোজা এসে হাজির হবেন তিনি পর্যটক আবাসে ভ্রম সংশোধন করিয়ে নেবার জন্য। বহিরাগত খদ্দেরদের জন্যে এই ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ তুলনাহীন। ওড়িশা সরকারের এই পান্থনিবাসের জন্য কোন কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। যিনি দেখভাল করেন তিনি বস্তুত রাজ্য পর্যটন সংস্থার ফুলবনি অফিসের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। স্বল্পভাষী, স্বভাবনম্র ভদ্রলোক অতিথিদের সহায়তায় কার্পণ্য করেননা। পান্থনিবাসের বারান্দায় চেয়ারে বসে রোজ সন্ধ্যায় সামনের নিকশ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন তিনি। এখানে তার সঙ্গী বলতে একটি চোট রেডিও আর ফুলবনিতে ফেলে আসা পরিবারের জন্য মন কেমন করা। সিআরপি-তে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়া বড় ছেলেটির জন্য ভাবনা বড় বেশি। মাঝে মাঝে দুরচারজন পর্যটক এলে তবু ভাল লাগে। পান্থনিবাসে যখন কোনও অতিথি থাকেনা তখন খুব নিঃসঙ্গ। ভয়ও যে হয়না এমন নয়। তিনি সদর দরজায় তালা দিয়ে বাজারের রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা পায়চারি করে বেড়ান। রাত - বিরেতে হঠাৎ হঠাৎ স্বাভাবিক - অস্বাভাবিক অতিথির গাড়ি অন্ধকার ফুঁড়ে এসে হাজির হয়। অর্থনৈতিক কারণে নাকি ওড়িশা সরকারের প্রায় সমস্ত বিভাগে নিয়োগের ওপর কোপ পড়েছে। পর্যটনও রেহাই পায়নি। অথচ মানুষকে ভ্রমণে উৎসাহী করে তোলার জন্য সরকারি ঢক্কানিনাদ সব রাজ্যেই অন্তহীন। পরিণামে সরকারি অক্ষমতার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের তাণ্ডব সহসাই প্রলুব্ধ করবে পর্যটককুলকে। বিধ্বস্ত হবে ডারিংবাড়ি পরিকল্পনা যার আদুরে নাম ইকোট্যুরিজম। অন্যত্র যেমন হয়ে থাকে। নিজেদের অপরিকল্পিত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের ফলে প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ধ্বংস করে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলার ভণিতায় ইকোট্যুরিজমের বিলম্বিত কোরামিন।

নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্রের খোঁজে যখন তোলপাড় হয়ে চলেছে চারিদিক, তখন ডারিংবাড়ি আর কতদিন অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে বলা কঠিন। অচিরেই হয়তো এখানে সাজ সাজ রব উঠবে। শিল্পোদ্যোগীমহলে পড়ে যাবে সাড়া। নতুন নতুন অত্যাধুনিক অতিথিশালায় রাতারাতি ঢেকে যাবে দিগবলয়, দিগন্তে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়শ্রেণী। যেমন হয়েছে দার্জিলিং -এর লোলেগাঁও, সিকিমের পেলিং বা দীঘা - ঘেঁষা শঙ্করপুর, অতি সম্প্রতি। বদলে যাবে গোটা ল্যাণ্ডস্কেপটাই। আজ যাদের চোখে বরফহীন ডারিংবাড়ির কোন মানে নেই, তারাও নিশ্চিত ভিড় জমাবে হোটেলে ব্যবসা - অধ্যুষিত ভোল পাল্টেযাওয়া গ্রামটিতে। পর্যটকের ঢল হাতছানি দেবে আরও পর্যটককে। তারা দেখবে পরিবেশকে নয়, পরস্পরকে। সেই দেখাশোনায় স্থানীয় অধিবাসীদের কোনও ভূমিকা থাকবেনা। তারা অবাক দৃষ্টিতে দেখে যাবে শহুরে অতিথিদের ভ্রুক্ষেপহীন আমোদ। ডারিংবাড়িও হয়ে উঠবে আর একটা সাতপাড়া, বারকুল, কপিলাস কিংবা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর। ঝকঝকে স্যুটকেস হাতে ফেরার গাড়িতে ওঠার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা বিরসবদন ভ্রমণার্থীর সেই স্বগতোক্তি আর শোনা যাবেনা, 'কেন যে মরতে এখানে এলাম? কিস্যু নেই। বোগাস।' সেই পরিস্থিতিতে সত্যিই নিঃস্ব হয়ে যাবে ডারিংবাড়ি। এই নিরালা উপত্যকার কাছে আর ফিরে আসবে না কোনও রোমান্টিক পর্যটক, হিমেল সকালে কুয়াসা ঢাকা শৈলশ্রেণী ছিল যার প্রাণের আরাম। রাঙামাটির পথ ধরে চড়াই ভেঙে যে অরণ্যের নিস্তব্ধতায় কান পেতে থাকতো। কারণ, সেই ডারিংবাড়ি তখন আর উদার প্রকৃতি থাকবেনা, নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে যাবে উঠবে পর্যটকের সেবায় উৎসর্গীকৃত বাণিজ্য পশরা মাত্র। বরং তার 'কিস্যু না থাকাই ভালো। সেটাই তার অহংকার যা অবশ্যই মানায় তার ৪০০০ ফুট উচ্চতার সঙ্গে।